গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪১ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ মে ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

অপারেশন সিঁদুর
ভারতবাসী কী পেলেন

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে এই জল্পনার মধ্যেই ১০ মে দুই দেশের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা স্বস্তির বাতাস নিয়ে আসে। ওই দিনই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ এই যুদ্ধ বিরতি দুই দেশের জনগণকেই স্বস্তি দিয়েছে জানিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন বিজেপি সরকার দুই দেশের বিষয়টি নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি না করে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যারা প্যালেস্টাইনকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে ইহুদিবাদী ইজরায়েলকে সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করছে, তাদের ভারত-পাক যুদ্ধে শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিল?

যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, নিরীহ মানুষের প্রাণহানি, সম্পত্তি ধ্বংস, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। এই ক্ষতি কোনও একটি দেশের নয়, যুযুধান দুই দেশেরই। যুদ্ধ যখন থেমে গেল, বিজেপি গোটা দলকে নামিয়ে দিয়েছে দেশ জুড়ে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার করতে 'তিরঙ্গা যাত্রা'র মিছিলে। যাতে সামনের বিহার নির্বাচন সহ পরপর নির্বাচনগুলিতে এর থেকে ফয়দা তোলা যায়। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে পুলওয়ামা বিস্ফোরণে ৪০ জন জওয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যুকে এই ভাবেই পুরোপুরি নির্বাচনী স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল বিজেপি।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ, যাঁরা সন্ত্রাসবাদকে আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করেন, চান দেশের একটি মানুষেরও যেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রাণ না যায়, পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদ যেন চিরতরে মুছে যায়, তাঁদের মনে এখন একের পর এক গুরুতর সব প্রশ্ন উঠে আসছে— যে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে বিজেপি নেতারা আকাশ-বাতাস তোলপাড় করে চলেছেন, তা কি আদৌ সফল হল? এই অপারেশন সন্ত্রাসবাদী

দুয়ের পাতায় দেখুন

রক্তাক্ত শিক্ষকদের সমর্থনে ছাত্ররা ধর্মঘট করল মার খেয়েই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ধর্মঘটের সমর্থনে পথ অবরোধ

১৯ মে এআইডিএসও-র ডাকে রাজ্য জুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র ধর্মঘট সফল করায় ছাত্রসমাজকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় এক বিবৃতিতে বলেন,

পাঁচের পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের ন্যায্য প্রশ্নের সামনে নিরুত্তর সরকার লাঠিকেই আশ্রয় করছে

১৫ মে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সামনে মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে শিক্ষকের। পা ভাঙার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন দিদিমণি। চোখের আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছেন শিক্ষক। পুলিশ লাঠিপেটা করতে করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে। এক শিক্ষিকাকে ১০-১২ জন বীরপুঙ্গব পুলিশকর্মী চ্যাংদোলা করে সরিয়ে দিচ্ছে। নিরস্ত্র শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মেরে লাঠি ভেঙে ফেলছে পুলিশ। সঙ্গে অশ্লীল গালাগাল। অফিসার থেকে কনস্টেবল সকলের চোখেমুখেই যেন এক তীব্র ঘৃণা! তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কাদের উপরে? যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা দিনের পর দিন পরিশ্রম করে যোগ্যতা অর্জন করেছেন, চাকরির পরীক্ষা দিয়ে তা পেয়েছেন।

রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ভেঙে পড়া পরিকাঠামোর মধ্যেও সাত-আট বছর ধরে স্কুলে যোগ্যতার সাথে পড়িয়েছেন।

চারের পাতায় দেখুন

বিকাশভবনে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মিছিলে হাঁটছেন রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ১৬ মে।

হাওড়ার বেলগাছিয়ায় পানীয় জলের দাবি আদায় ক্ষতিগ্রস্তদের

হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি এক মাস পরেও পুনর্বাসন পায়নি। তীব্র গরম ও প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ত্রিপল টাঙিয়ে তাঁরা দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের না আছে শৌচাগার, না আছে পানীয় জলের ব্যবস্থা। বিপর্যয়ের পরেই শাসক ও বিরোধী দলের নেতারা এলাকায় গিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। খবরের কাগজে তা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি কোনও সুরক্ষা আজও পায়নি। প্রশাসন মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে ১৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দায় সেরেছে।

এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে হাওড়া নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। মঞ্চের উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পানীয় জল, শৌচাগার, রাস্তাঘাট, জলনিকাশি, বিদ্যুৎ এবং ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণের দাবিতে জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মঞ্চের অভিমত, এই বিপর্যয় ম্যানমেড। ভূমির ধারণ ক্ষমতার বেশি ময়লা চাপানোর ফলে এই বিপর্যয় ঘটেছে। অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। প্রতিরোধ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ বলেন, সাত দিনের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সরকার এবং প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি পালনের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত

আটের পাতায় দেখুন

অপারেশন সিঁদুর ঃ ভারতবাসী কী পেলেন

একের পাতার পর

কার্যকলাপকে কি এতটুকুও আটকাতে পারল? ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ঐক্য, যা সন্ত্রাসবাদীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, এই অপারেশন দেশের সেই আভ্যন্তরীণ সংহতিকে কতখানি বাড়াতে পারল? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেশের মানুষের কাছে বিজেপি সরকারকে স্পষ্ট ভাবে দিতে হবে। যদি তারা দিতে না পারে তবে যুদ্ধের নামে মানুষের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার জন্য তারাই দায়ী থাকবে।

ভারত আমেরিকার মধ্যস্থতা মানল কেন

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন ভারতীয়ের মৃত্যুর পর বিজেপি-আরএসএস বাহিনী এবং তাদের আইটি সেল একে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হিসাবে প্রচার করে দেশজুড়ে মুসলিম বিদ্বেষের বিষাক্ত ঝড় তুলে দিয়েছিল। তারপর অপারেশন সিঁদুর নাম দিয়ে পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হামলা শুরু হতে তাকেও পাকিস্তানের উপর ভারতের বিরাট প্রত্যাঘাত বলে প্রচার শুরু করে দেয়। তারা প্রচার করতে থাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর হাত থেকে অপরাধীরা রেহাই পাবে না। অথচ এখন বিদেশ সচিবের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানে ভারতের বিমান হামলা ছিল পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, আগাম বলে-কয়ে। যুদ্ধ কয়েক দিন চলল, দেশের সাধারণ মানুষ সমাজমাধ্যমে এবং সংবাদ চ্যানেলগুলির পাগল-প্রায় প্রচারে যুদ্ধ নিয়ে যখন উত্তেজিত, ঠিক এই সময়ে হঠাৎই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে দিলেন, "আমেরিকার মধ্যস্থতায় রাতভর আলোচনার পরে, আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ভারত এবং পাকিস্তান অবিলম্বে পূর্ণ বিরতিতে সম্মত হয়েছে।"

ট্রাম্পের এই ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি সরকার দেশের মানুষের অজস্র প্রশ্নের মুখে পড়লেন— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কী করে সবার আগে যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করে দিলেন? মোদি সরকারই বা কী শর্তে আমেরিকার মধ্যস্থতা মেনে নিল? সরকার স্পষ্ট করে দেশবাসীকে জানাক, পহেলগামের হামলায় জড়িত সন্ত্রাসবাদীদের, যারা ভারতীয় সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী পাকিস্তানে আশ্রয়প্রাপ্ত, তাদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার শর্ত কি তার মধ্যে রয়েছে? কিন্তু এ সব কোনও প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর অন্য মন্ত্রীরা দেশের মানুষকে দেননি। ধরেই নেওয়া যায়, এ সব প্রশ্নের কোনও উত্তর সরকারের কাছে নেই।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি যুদ্ধের বদলে ব্যবসার পরামর্শ দিয়েছেন দুই দেশকে। বলেছেন, তিনি বাণিজ্য বন্ধের হুঁশিয়ারি দেওয়াতেই কাজ হয়েছে। ভারত কি তবে সন্ত্রাস বন্ধের শর্ত থেকে সরে গিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসার শর্তে যুদ্ধবিরতি মেনে নিল? ব্যবসার কোন শর্তে ভারত যুদ্ধ বিরতি মানল? এই মধ্যস্থতার বিনিময়ে ভারত কি তবে আমেরিকার পণ্যের জন্য দেশের বিরাট বাজার হাট করে খুলে দেবে? সাম্প্রতিক আরব দেশগুলি সফরের সময়ে দোহায় দাঁড়িয়ে ট্রাম্প দাবি করেছেন, আমেরিকার প্রায় সমস্ত পণ্যে আমদানি শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনতে রাজি হয়েছে ভারত এবং সেই মর্মেই চুক্তি করার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে এমন চুক্তি ভারত কবে করল? সেই চুক্তিতে কি ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেল? দেশের জনগণ, এমনকি বিরোধী দলগুলি, যারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সবাইকে অন্ধকারে রেখে প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতারা কি গোপনে এমন চুক্তি করলেন? এর দ্বারা কি তাঁরা দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করলেন, নাকি দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করলেন? উল্লেখ্য, এ দিনই দোহায় ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। তা ছাড়া সংবাদমাধ্যমের খবর থেকেই জানা যাচ্ছে, আমেরিকা পাকিস্তানকে বাণিজ্যে বিপুল ছাড় দিতে চলেছে। তা হলে সংঘর্ষ বিরতিকে শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে ডুবন্ত অর্থনীতির পাকিস্তান যদি আমেরিকার সঙ্গে তার বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে পারে তবে তো অপারেশন সিঁদুরের দ্বারা পাকিস্তানই লাভবান হল দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, "পাকিস্তানের তরফ থেকে সংঘর্ষ বিরতির প্রার্থনা করা হয়েছিল। পাকিস্তান বলেছিল, তাদের দিক থেকে আর কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বা সামরিক দুঃসাহস দেখানো হবে না। তার পরেই মোদি সরকার এ নিয়ে বিবেচনা করেছে।" এ ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে স্পষ্ট ভাবে কিছু জানাতে রাজি হননি। প্রশ্ন উঠেছে, সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব পাকিস্তান যদি দিয়ে থাকে তবে পাকিস্তানের তরফে কে দিল? ভারতের কাকে দিল? পাকিস্তান কি কোনও লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? তা যদি না হয় তবে তা দেশের মানুষকে জানানো হল কীসের ভিত্তিতে? তা ছাড়া বিদেশ দফতরের প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলি নেই কেন? দেশের মানুষ এগুলি জানতে চাইলেও প্রধানমন্ত্রীর তরফে এ সব প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। অপারেশন সিঁদুরে ভারতের জয়টা তা হলে কী ঘটল?

ট্রাম্প বলেছেন, কাশ্মীর প্রশ্নে তিনি নিজে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যস্থতা করবেন। তিনি উভয় দেশকে নিরপেক্ষ জায়গায় আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন। বিজেপি সরকার কি এই আলোচনায় রাজি হয়েছে? যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে এটিও কি কোনও শর্ত হিসাবে কাজ করেছে? ভারতের দীর্ঘ দিনের নীতি— কাশ্মীর দ্বিপাক্ষিক বিষয়। ট্রাম্পের এই প্রস্তাব এবং পাকিস্তানের তাতে রাজি হওয়া তো বাস্তবে কাশ্মীর সমস্যায় মার্কিন হস্তক্ষেপ। অথচ তৃতীয় শক্তির মধ্যস্থতা গত ৫০ বছর ধরে ভারতের বৈদেশিক নীতিতে স্থান পায়নি। তা হলে অপারেশন সিঁদুর কি এ বার আমেরিকাকে ঢোকার সুযোগ করে দিল?

ভারত কারও সমর্থন জোগাড় করতে পারল না কেন

কাশ্মীর প্রশ্নে আমেরিকা ছাড়াও রাশিয়া এবং চিন দুই দেশকে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়েছে। এ বার ব্রিটেনের নামও এই দলে যুক্ত হল। কয়েক দিন আগে যে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারত অবাধ বাণিজ্য চুক্তি করে ব্রিটেনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের কথা ফলাও করে প্রচার করছিলেন বিজেপি নেতারা, সেই ব্রিটেনও এ ব্যাপারে ভারতের উপর চাপ বাড়াতে নেমে পড়েছে। মনে রাখা দরকার, বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ পহেলগাঁও সন্ত্রাসের নিন্দা করলেও কোনও বড় শক্তিই কিন্তু পাকিস্তানের নাম সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়ায়নি, তেমনই ভারত পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ দেওয়ার বিরোধিতা করলে তাতেও তারা সায় দেয়নি। সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করে ভারতের পাকিস্তানকে জল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পায়নি। বরং এ ক্ষেত্রে তারা ভারতকে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলার পরামর্শই দিয়েছে। বিজেপির প্রচারক বাহিনী এবং ধামাধরা মিডিয়া বাহিনী প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বগুরু হিসাবে প্রচারের যে বিরাট বেলুন তৈরি করেছিলেন, চার দিনের যুদ্ধই তাকে ফুটো করে দিল। বাস্তবে বিজেপি সরকারের ভুল বিদেশনীতিতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ভারতের ২৬ জনের নির্মম মৃত্যু এবং পাকিস্তানি গোলায় ১০ হাজার বাড়ি এবং ২২ জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু সত্ত্বেও ভারত কি বিশ্বে একা হয়ে পড়ল না? একা যে হয়ে পড়েছে তা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যখন বিজেপি সরকার দেশে দেশে প্রচার করার জন্য বিরোধী দলগুলির সদস্যদের নিয়ে কমিটি গড়ে দিল। বিজেপি সরকারের গত এক দশকের শাসনে যে বিরোধীদের শুধু অবজ্ঞাই জুটেছে তাদের প্রতি সরকারের এত আস্থাই বুঝিয়ে দেয় সরকার যুদ্ধ থেকে ফয়দা তুলতে গিয়ে বাস্তবে গোটা দেশকেই একঘরে করে ফেলেছে।

সমাজমাধ্যম এবং ধামাধরা চ্যানেলে মিথ্যার বন্যা

পহেলগাঁও গণহত্যার মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা মোকাবিলায় সরকার দেশের অভ্যন্তরেই বা কতটুকু সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা করল? এই গণহত্যা দেশ জুড়ে মত-ধর্ম নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্ত এবং ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। এই বিক্ষোভে কাশ্মীরও বাকি দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সংসদীয় বিরোধীরা সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে গোটা দেশের আবেগ একত্রিত হয়েছিল। আর এ ক্ষেত্রে শাসক দলের ভূমিকাটি কী ছিল? তাদের ভূমিকা ছিল পুরোপুরি ঐক্য-সংহতির বিরোধী। বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর হাতে কাশ্মীরের ছাত্ররা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আক্রমণের শিকার হতে শুরু করলেন। সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেও যাঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করলেন এবং এর পিছনে যে বিজেপির একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে সেই সন্দেহের কথা বললেন, তাঁদের দেশদ্রোহী, পাকিস্তানপন্থী বলে দেগে দেওয়া হতে থাকল। পহেলগাঁও ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর যাঁরা বিরোধিতা করেলেন তাঁদের 'সেকু' বলে গালি দেওয়া হতে থাকল। বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর এই প্রচারে তাল মেলায় সরকারি এবং একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদ চ্যানেলগুলি। যে দু-একটি চ্যানেলের উপর সত্য খবরের জন্য কিছুটা নির্ভর করা চলত, সেগুলিও ফেক তথা মিথ্যা, বানানো খবর প্রচারের লজ্জাজনক উন্মাদনায় এমন মেতে উঠল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় মিডিয়ার মর্যাদা কার্যত ধুলোয় মিশে গেল।

বিজেপি নেতাদের প্রচার জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে গেল

এই উন্মাদনা এমন মাত্রায় পৌঁছল যে, পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে নিহত বায়ুসেনার আধিকারিক বিনয় নারওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী যখন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেও কাশ্মীরী এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ না ছড়ানোর কথা বলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথা-যন্ত্রণাকে পর্যন্ত কোনও আমল না দিয়ে তাঁকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকল এই কুৎসা-বাহিনী। সমাজের সচেতন অংশের বিরুদ্ধে বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর এই কুৎসা যে নিছক কোনও আবেগ প্রসূত নয় তা বুঝতে কারওরই অসুবিধা হয়নি যখন দেখা গেল কোনও বিজেপি নেতা-মন্ত্রীই অনুগামীদের এই কুৎসিত আচরণের বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলেন না। আবার খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশসচিব সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করলে এই শক্তিই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের আকার নিয়ে তাঁকেও আক্রমণ করতে ছাড়ল না। তাঁকে শুধু দেশদ্রোহী, পাকিস্তানপন্থী বলেই এই বাহিনী ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর মেয়ের নামেও কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করতে থাকে। যুদ্ধের অগ্রগতি ঘোষণা করতে সাংবাদিক সম্মেলনে একজন মুসলিম এবং একজন শিখ মহিলা সেনা অফিসারকে পাশে বসিয়ে বিদেশসচিব ধর্মনিরপেক্ষতার যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তাকে পর্যন্ত নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপির যুদ্ধবাজ নেতা-কর্মীরা তাঁদের কলঙ্কজনক অপপ্রচারে। যেখানে সোসাল মিডিয়ায় এতটুকু সরকার বিরোধিতা দেখলে কর্তৃপক্ষ, সরকার এফআইআর করতে এতটুকু দেরি করে না, সেখানে এই মিথ্যা, বানানো এবং জাতীয় সংহতির পরিপন্থী প্রচারের বন্যাতেও একটি এফআইআর-ও তাদের করতে দেখা যায়নি। শাসক শক্তির পরিচালনায় দেশের স্বার্থকে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে বিভাজনের রাজনীতির কাছে বলি দেওয়া হল।

তাই বিজেপি যতই 'ত্রিরঙ্গা যাত্রা' করে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার করতে থাকুক, বাস্তবে এই অপারেশনের দ্বারা সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করা তো গেলই না, এমনকি পহেলগাঁও কাণ্ডে দোষীদেরও চিহ্নিত করা গেল না। ভারতের অভ্যন্তরীণ সংহতি আরও দুর্বল হয়ে বিভাজন আরও চওড়া হল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও দুর্বল হল। কাশ্মীরের বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক থেকে বহু পাক্ষিক বিষয় হয়ে উঠল। তাই সাফল্য দূরে থাক অপারেশন সিঁদুর বহু অপ্রীতিকর প্রশ্ন তুলে দিল।

মহারাষ্ট্রের ধারাভি বস্তির উন্নয়ন প্রকল্প কার স্বার্থে

বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করছে এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি ধারাভি। প্রায় আড়াই বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে সেখানে বাস করেন ১০-১২ লক্ষ মানুষ। ওই এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ৫ হাজার ছোট বড় কারখানা। এখানকার চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, জামাকাপড়, প্লাস্টিক রিসাইক্লিংজাত দ্রব্য ইত্যাদি শুধু মুম্বাই বা ভারত নয়, ছড়িয়ে পড়ে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে। গোটা মুম্বাই শহরের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এই ধারাভি বস্তিতে বসবাসকারী মানুষগুলির অবদান অনন্য। কাকভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এদের শ্রম নিংড়ে মুম্বাই হয়ে ওঠে আলোকোজ্জ্বল নগরী।

অথচ বস্তির এই মানুষগুলির বসবাস অন্ধকারে। সুস্থভাবে এক জনের চলবার মতো প্রশস্ত গলিও এখানে কম, মধ্য দুপুরেও বহু জায়গায় পৌঁছয় না সূর্যের এক বিন্দু আলো। পাশের নদী মজে এখন আবর্জনাময় নালা। প্রায়ই সেই নোংরা জল ঢুকে আসে বস্তির এক চিলতে ঘরের ভিতর। নেই পর্যাপ্ত পরিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, যথাযথ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। শিশুরা প্রায়ই আক্রান্ত হয় টাইফয়েড, কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি ব্যাধিতে। পুতিগন্ধময় এই পরিবেশে বস্তির মানুষগুলির গড় আয়ু কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ বছরে।

ধারাভির উন্নয়ন নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারের পরিকল্পনা চলছে দশকের পর দশক ধরে। গত বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার ঠিক একদিন আগে সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় ধারাভি বস্তির পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষকে তারা পুনর্বাসন দেবে। প্রচার করে এশিয়ার এই বৃহত্তম বস্তিকে তারা আধুনিক 'আরবান হাব'-এ পরিণত করবে। দরিদ্র বস্তিবাসী মানুষগুলির জীবনের দুর্বিষহ অবস্থায় চিন্তিত সরকার যদি কোনও পদক্ষেপ নেয় সে তো আশারই কথা। কিন্তু তা কি হচ্ছে?

১০-১২ লক্ষ মানুষের মধ্যে যদি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় তবে বাকিরা যাবেন কোথায়? বাসিন্দাদের কাছে কোনও পরিষ্কার চিত্র নেই, নেই কর্তৃপক্ষের দিক থেকে স্বচ্ছ কোন উত্তরও। বিশেষ করে ওই বস্তিতে যে মানুষগুলি ঘরভাড়া নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছেন, তাঁদের কী হবে, নতুন প্রকল্পে থাকার জন্য ঘর মিলবে কি না— তাও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ফলে প্রবল আশঙ্কায় দিন কাটছে মানুষগুলির। শুধু উচ্ছেদ হওয়ার ভয় নয়, ধারাভির বর্তমান বাসিন্দারা এরই সঙ্গে রুজি-রোজগার হারানোর আতঙ্কেও ভুগছেন। কারণ, এই বস্তিতে থাকা অগুন্তি ছোট কারখানা তাঁদের দু'বেলার খাবার জোগায়।

লক্ষণীয় বিষয় হল, মহারাষ্ট্র সরকারের স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন অথরিটি (এসআরএ) ধারাভি রিডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (ডিআরপি) জমি বাছাই থেকে অন্যান্য প্রায় সমস্ত দায়িত্ব দেশের একচেটিয়া শিল্পপতি আদানির হাতে তুলে দিয়েছে। ডিআরপি, যাকে এখন এনএমডিপিএল (নবভারত মেগা ডেভলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড) বলা হচ্ছে, সেই এনএমডিপিএল-এর ৮০ শতাংশ শেয়ার আদানিদের হাতে, বাকি ২০ শতাংশ স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন অথরিটির হাতে রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, এই এনএমডিপিএল ধারাভি বস্তির পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য মুম্বাইয়ের যে দিওনার এলাকায় জমি বেছে নিয়েছে তা বাস্তবে একটি চালু ধাপার মাঠ। সিপিসিবি (সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড)-এর ২০২১ গাইডলাইন অনুসারে একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া আবর্জনা কেন্দ্রে কোনও হাসপাতাল বা স্কুল তৈরি করা যায় না। আবর্জনা কেন্দ্রের সীমানা থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করা যায় না। প্রশ্ন উঠছে, নিয়ম যদি তা-ই হয় তবে দিওনারের মতো একটি চালু ধাপার মাঠে আবাসস্থল তৈরির ছাড় পত্র মিলল কী ভাবে? ২০২৪ সালের সিপিসিবি রিপোর্ট অনুসারে, দিওনারের বাতাসে ছড়িয়ে আছে বিষাক্ত গ্যাস। প্রতি ঘন্টায় ওই এলাকায় ৬২০২ কেজি বিষাক্ত মিথেন নির্গত হচ্ছে। ভারতের ২২টি প্রধান মিথেন হটস্পটের মধ্যে দিওনার একটি। আবর্জনার তরল ও মাটির তলার জলের সংযোগে ওই এলাকার জলও ব্যাপক দূষিত। এখানে রয়েছে দুটি প্ল্যান্ট— একটি ওয়েস্ট টু এনার্জি (ডব্লিউটিই) ও অন্যটি বায়ো সিএনজি। পুনর্বাসন প্রকল্পটি তৈরি হতে চলেছে দুটি প্ল্যান্টের প্রায় ৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে। নিয়ম অনুসারে কোনও ডব্লিউটিই প্ল্যান্টের ৩০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে আবাসস্থল থাকা উচিত নয়। ডব্লিউটিই প্ল্যান্ট থেকে যে ছাই ও ধোঁয়া নির্গত হয় তা এলাকায় ব্যাপক বায়ু দূষণ ঘটায়। জানা গেছে, এই প্রকল্পের এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাব সংক্রান্ত সমীক্ষা এখনও পর্যন্ত করা হয়নি, যা প্রকল্পের পরিকল্পনার সময়েই করে ফেলার কথা। এ ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন 'নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার আগে সমস্ত প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিয়ে নেওয়া হবে।' এ কথা পরিষ্কার যে, সরকারি প্রভাব খাটিয়ে কোনও রকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই এটা তাঁরা করে ফেলবেন।

বাস্তবে ধারাভির মানুষগুলিকে এক আঁস্তাকুড় থেকে আরেক আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলা হতে চলেছে। এই যে আবর্জনা কেন্দ্রের ভিতরে ব্যাপক দূষণের মধ্যে এক মৃত্যু-উপত্যকায় পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে বিজেপি সরকার, এর কারণ কী? সরকারি দপ্তরগুলি একে অপরের উপর দায় চাপিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন এড়াচ্ছে। প্রকল্পের সর্বাধিক শেয়ারের মালিক আদানিদের তরফ থেকে কোনও উত্তর নেই। ডিআরপি-র সিইও ও এক সিনিয়র আইএএস অফিসার শ্রীনিবাস প্রশ্নের উত্তরে মুম্বাইয়ের জমি সংকট ও বিকল্প জমির সংখ্যা কম হওয়ার কথা বলেন। বলেন, 'ডিআরপি'-র জন্য ২০০ থেকে ৩০০ একর জমির প্রয়োজন। তাই এর অসুবিধাগুলি জানা সত্ত্বেও দিওনারকে বেছে নিতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এই অসুবিধাগুলি জানা সত্ত্বেও কোনও সরকারি আধিকারিক বা সরকারের কোনও মন্ত্রী কি পরিবারসহ বসবাস করতে পারবেন ওই এলাকায়? নাকি আদানি সাহেব ওখানে তাঁর কোনও অফিস খুলতে পারবেন? উত্তরটা সকলেরই জানা। এ কেবল দরিদ্র বস্তিবাসীদের জীবন নিয়ে এক নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র।

আসলে মুম্বাই শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত ধারাভি বস্তির বিপুল পরিমাণ জমি আদানি সাহেবের চাই। তিনি সেখানে প্রোমোটিং করে লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা লুটবেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই একচেটিয়া শিল্পপতির আবদার তো যে কোনও মূল্যে রাখতেই হবে মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের কর্তাদের। তাই উন্নয়নের নামে গোটা বস্তি এলাকাটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে আদানিদের হাতে। সেখানকার উচ্ছেদ হতে চলা হতদরিদ্র বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা দেখার দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয়েছে আদানি-কোম্পানিরই ওপরে। আদানি সাহেব তো আর সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নামেননি! তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, প্রোমোটিং ব্যবসায় বিপুল মুনাফা লোটা। সেই লুটের ধাক্কায় দিন আনা-দিন খাওয়া ধারাভি বস্তির বাসিন্দাদের অন্ধকার জীবন যদি আরও বেশি সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যায়, তো যাক না! আদানি সাহেবরা তার জন্য চিন্তিত নন। তাই বিষাক্ত গ্যাসে ভরা চরম অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাময় একটি অ-বাসযোগ্য এলাকাই নির্ধারিত হয়েছে দুর্ভাগা এই মানুষগুলির বসবাসের জন্য। আদানি সাহেবদের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একচেটিয়া কারবারিদের মুনাফার কাছে এইসব হতদরিদ্র মানুষগুলির জীবনের দাম আর কতটুকুই বা! তাই মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবায় তাঁরা দাসখত লিখে দিয়েছেন যে!

হায় রে পুঁজিবাদী সভ্যতা! ধনগর্বে ঝলমল করতে থাকা এই মুম্বাই শহরের সবটুকুই যে গড়ে উঠেছে ধারাভি বস্তির বাসিন্দাদের মতো অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের ঘাম-রক্ত ঝরানো পরিশ্রমের বিনিময়েই! এই বস্তির বিশাল এলাকা জুড়ে আগামী দিনে তৈরি হবে যে সব বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট বা উচ্চবিত্তদের বসবাসের ফ্ল্যাট, সেগুলিও হয়তো গড়ে উঠবে এখানকার উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলিরই মেহনতে। সামান্য মজুরির বিনিময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধনীদের প্রাসাদ গড়ে দিয়ে দুর্ভাগা এই মানুষগুলি ফিরে যাবে দিওনারের আঁস্তাকুড়ে নিজেদের ডেরায়। যতদিন জীবনীশক্তি থাকবে, ততদিন এভাবেই তাঁরা কাটিয়ে যাবেন অ-মানুষের জীবন।

এঁদেরই ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাবেন এই ঘোরতর অন্যায় আর অবিচারকে। কিন্তু এই অন্যায়-অবিচার মেনে নিতে রাজি নন মুম্বাই শহরের কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও ধারাভির উচ্ছেদ হতে চলা বাসিন্দাদের একাংশ।

উপযুক্ত পুনর্বাসন, রুজি-রুটির ব্যবস্থা সহ নানা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছেন তাঁরা।

কোর্টের রায়ে বকেয়া ডিএ, দীর্ঘ আন্দোলনের জয়

এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া ডিএ সংক্রান্ত রায় প্রসঙ্গে বলেন, অনেক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সহ ডিএপ্রাপ্ত কর্মীরা আন্দোলন করছেন তাঁদের এআইসিপিআই অনুযায়ী বকেয়া ডিএ পাওয়ার জন্য। এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে চলছে বহু দিন যাবত। তারিখের পর তারিখ পরিবর্তন করে, মামলা ঝুলিয়ে রাখার পর আজ যে অন্তর্বর্তীকালীন রায় দেওয়া হয়েছে, তাতে কর্মীদের প্রাপ্য সমস্ত ডিএ দেওয়ার কথা না বলা হলেও, বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এ কথা আরও একবার প্রমাণিত হল যে, ডিএ কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত অধিকার। এটা কারও দয়ার দান নয়। তিনি বলেন, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দিতে হবে, রাজ্য সরকারকে বকেয়া ৩৭ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে ঘোষণা করতে হবে— বাকি ডিএ কত দিনের মধ্যে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সহ বিভিন্ন ধরনের ডিএ প্রাপকদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, যতদিন না পর্যন্ত সম্পূর্ণ বকেয়া ডিএ আদায় হচ্ছে, তত দিন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং তা তীব্রতর করে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

৪ মে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার দ্বাদশ পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়া শহরের মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে। সম্মেলন শুরুর আগে পহেলগাঁওয়ে পর্যটক হত্যা ও গণআন্দোলনে নিহতদের স্মরণে স্মারকবেদিতে মালা দেওয়া হয়। এরপর পুরুলিয়া জেলা সভাপতি অশোক নাগ স্মার্ট মিটার ও কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ বিল ২০২২-এর অর্ডারের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অশোক নাগ। অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলা ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিরোধী আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি পুরুলিয়াতে গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন রাখেন। তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা থাকা সিকিউরিটি ডিপোজিটের সুদের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গ্রাহকদের আবেদন জানান।

সম্মেলনে রঘুনাথপুরকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়া উত্তর জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটি গঠিত হয়। শৈলেন বাউরী সভাপতি, অনিল বাউরী সম্পাদক ও বিধান মণ্ডল কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অশোক নাগকে সভাপতি, সাগর আচার্যকে সম্পাদক ও প্রদীপ মিত্রকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে দক্ষিণ পুরুলিয়া জেলা কমিটি গঠিত হয়।

শিক্ষকদের পাশে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা

১৫ মে বিকাশ ভবনে যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে ব্যাপক পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ১৭ মে রাজ্যব্যাপী স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবং কলকাতার করুণাময়ী মোড় ও দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে স্কুল ছাত্রদের নিয়ে প্রতিবাদী গান কবিতা সহ মিছিল আয়োজন করা হয়। করুণাময়ী মোড়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদী গান কবিতা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

রাসবিহারী মোড়ে সমবেত স্কুল ছাত্রছাত্রীরা গান কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানায়। অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে ফেরানো, দুর্নীতিগ্রস্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়া, সমস্ত স্কুলের শূন্যপদে

শিক্ষক নিয়োগ, স্কুল বন্ধ করার চক্রান্ত ব্যর্থ করার দাবি সহ নানা প্ল্যাকার্ড সহযোগে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করুণাময়ী মোড় থেকে পদযাত্রা করে বিকাশ ভবনের সামনে যোগ্য শিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত হয় এবং সেখানে শিক্ষকেরা তাদের ক্লাস নেন। সেখানে নৈতিকতার পাঠ দান করা হয়। ব্যারাকপুর, মেদিনীপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, জয়নগর, পুরুলিয়া, পাঁশকুড়া, বেলদা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ও প্রতিবাদী কর্মসূচি হয়।

লাঠিকেই আশ্রয়

একের পাতার পর

এর আগে কসবার ডি আই অফিসে পুলিশ লাথি মেরেছিল। শিক্ষকদের এবার জুটল লাঠির বাড়ি।

পুলিশের লাঠিতে ৯ জন শিক্ষকের মাথা ফেটেছে আরও ১০ জনের, আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। কয়েকজনের হাত কিংবা পা ভেঙেছে, একজনের চোখ নষ্ট হওয়ার উপক্রম। আহত হয়েছেন শতাধিক। পুরুলিয়ার শিক্ষক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার রজত হালদার, জয়তী হালদার, শিক্ষক দুলাল মুর্মুর মতো অনেকেই মারাত্মক জখম হয়েছেন। কিন্তু দেখা গেল সরকারের মন্ত্রীরা শিক্ষকদের উদ্দেশেই নানা কটূক্তি ছুঁড়ে দিয়েছেন, রাজ্যের পুলিশ কর্তা বলে দিলেন তাঁরা নাকি 'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ' করেছেন। মানুষ পাল্টা প্রশ্ন করেছে, এই যদি 'ন্যূনতম'-র নমুনা হয়, লাঠিচার্জ তবে কাকে বলে? পুলিশ কি শিক্ষকদের মৃত্যু চেয়েছিল? দেখা গেছে পুলিশ আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। অথচ ওইদিন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের একদল দুষ্কৃতী পুলিশের পাশে থেকেই বারবার শিক্ষকদের আঘাত করেছে। রাতে বাইক বাহিনী নিয়ে এসে হুমকি দিয়েছে, পুলিশ ছিল নিছক দর্শক। সরকার বলেছে, লাঠিচার্জের আগে তাঁরা নাকি সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন! তাঁরা নাকি আটকে থাকা সরকারি কর্মীদের বার করে নিয়ে যেতেই লাঠি চালিয়েছেন। যদিও ওই বিকাশ ভবনে বসেই দিনের পর দিন চুরির ব্যবস্থা করে মন্ত্রী আমলারা বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন। শিক্ষকরা দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করে বসে ছিলেন, রাজ্য সরকার দুর্নীতিগ্রস্তদের তালিকা আদালতে বলে দিয়ে, ওএমআর শিটের সঠিক কপি প্রকাশ করে সমস্যার সমাধান করবে এই আশায়। সরকার তা করেনি কেন? শিক্ষামন্ত্রী এই বিকাশ ভবনে বসেই ওএমআর শিট প্রকাশের জন্য শিক্ষকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন? দিনের পর দিন চুরি করতে দিয়েছেন যে কর্তারা, তাঁরা বিকাশ ভবনের ঘেরাটোপে পুলিশি নিরাপত্তায় বসে থাকতে পেরেছেন কী করে?

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রথম এসএলএসটি-র মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা তাদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে ৭ মে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌজন্যতাটুকুও দেখাননি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর নানা রকম কথা সরকার বলেছে, অথচ সমাধানের কোনও রাস্তা তারা দেখায়নি। কারণ তাতে যে অযোগ্যদের কাছ থেকে বিপুল টাকা কামিয়েছেন শাসক দলের স্তরে স্তরে নেতারা, তা ফেরত দেওয়ার চাপ আসবে। এই অযোগ্যদের বাঁচানোটা এখন তৃণমূল নেতৃত্বের পবিত্র 'সরকারি কর্তব্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে! সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি নেতাজি ইন্ডোরে সভা ডেকে কিছু ভাসা ভাসা কথা বলে ক্ষতে পুলটিশ লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। ফলে রাস্তায় নামাই এখন চাকরিহারা শিক্ষকদের একমাত্র রাস্তা। তাঁরা বাধ্য হয়েই ১৫ মে বিকাশ ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন। ওই দিন সকাল থেকেই বিকাশ ভবনের গেটগুলোতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান চালাচ্ছিলেন হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। এই আন্দোলন ভাঙার জন্য প্রথমে শাসক দলের এক নেতা এবং তাঁর গুন্ডাবাহিনী শিক্ষকদের আক্রমণ করে। ঘুষি, লাথি এমনকি হেলমেট দিয়ে মারতে থাকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। পুলিশ যথারীতি নীরব থেকে গুণ্ডামিতে সাহায্যই করেছে।

উল্লেখ্য, শুরু থেকেই রাজ্য সরকার ও তার সংস্থা এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচানোর খেলায় নেমেছে। তাই কারা প্রকৃত নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে, আর কারা দুর্নীতিতে যুক্ত, তার সঠিক তথ্য সরবরাহ করেনি সঠিক সময়ে। সিবিআইও তা বার করার চেষ্টা করেনি। কারণ কেন্দ্রে বিজেপি সরকার তাদের তা করতে দেয়নি, পাছে দেশের অন্যত্র মধ্যপ্রদেশের 'ব্যাপম' কিংবা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ বা ত্রিপুরার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যের চাকরি দুর্নীতি নিয়ে প্রকৃত তদন্তের দাবি উঠতে থাকে। অন্য দিকে সুপ্রিম কোর্টও সিবিআই এবং রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেনি প্রকৃত সত্য সামনে আনতে। চাল থেকে কাঁকর বাছার পরিশ্রম কেউই না করায় সৎ মানুষের চাকরি গেছে, যারা দুর্নীতি করল, টাকা নিয়ে চাকরি বেচল তাদের গায়ে কোনও আঁচড় পড়ল না। অন্য দিকে সিপিএম ও বিজেপির মতো বিরোধী দল আশা করেছে সব টালমাটাল করে দিতে পারলে তাদের ভোট রাজনীতিতে সুবিধা হবে। তাই তারা প্রথম থেকে চেয়েছে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করার দরকার নেই— সবার চাকরি বাতিল হোক। শুধু সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্যই সব শিক্ষককে 'ফ্রড' বলেননি, তাদের দলীয় শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন সকলেই প্রথম থেকে এই দাবি করেছে। বিজেপির বর্তমান সাংসদ, একদা বিচারপতিও তাই চেয়েছিলেন। আর সকলের চাকরি বাতিলে বিজেপি নেতাদের উল্লাসে তো এই কথাটা এখন স্পষ্টই। ফলে নিরপরাধ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা নিজেদের যোগ্যতায় ৭-৮ বছর চাকরি করার পর তাদের পথে বসিয়ে দেওয়ার দায়ভার যেমন সবচেয়ে বেশি রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে, তেমনই এই সব বিরোধী দলগুলির নেতাদের দায়ও একেবারে কম নয়।

সরকারের চুরির দায়ে গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি কর্মীদের চাকরিও সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে। তার দায়ভার না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাদের মাসিক ২৫ হাজার টাকা বা ২০ হাজার টাকা ভাতাজীবী করতে চেয়েছেন, যা কোনও ভাবেই মানা যায় না। শিক্ষক নিগ্রহের নির্মম ঘটনার পরেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য পুলিশের আচরণের তীব্র ধিক্কার জানান এবং পরের দিন ১৬ মে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় দল। কলকাতা সহ রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে এসপ্ল্যানেডে মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ছাত্র-যুবরাও বিক্ষোভে নামে। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে করুণাময়ী সহ অন্যত্র বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। ভুক্তভোগী আন্দোলনকারীরা বিকাশ ভবনের সামনে ১৬ মে ধিক্কার সভার ডাক দেন। এই সভায় বিশিষ্ট চিকিৎসক বিনায়ক সেন, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী মীরাতুন নাহার, আরজিকর আন্দোলনের অন্যতম মুখ ডাঃ অনিকেত মাহাতো, অধ্যাপক দেবব্রত বেরা, রাত জাগো আন্দোলনের কর্মী শিক্ষিকা শতাব্দী দাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রদোষ পাল, ডাক্তার দেবাশীষ হালদার, শিক্ষক নেতা বাসুদেব দাস, অধ্যাপক শান্তনু রায় প্রমুখ উপস্থিত হয়ে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান। এই সভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং সিপিআইএমের এক নেতা সংহতি জানাতে গেলে তাঁদের ও তাঁদের দলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থবিরোধী ভূমিকা তুলে ধরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। ১৭ মে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তাদের শিক্ষকদের প্রতি এই অপমানজনক আচরণের নিন্দা করে। রাজ্যের সর্বত্র ধিক্কার মিছিল করে এআইডিএসও। ১৯ মে এআইডিএসও-র ডাকে হয় সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট।

চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলন আজ জনসাধারণের আন্দোলন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ রুখে দাঁড়ানোর পথে এগোচ্ছেন। যতক্ষণ না দাবি আদায় হয় আন্দোলনে অনড় থাকছেন ভুক্তভোগীরা। এই আন্দোলন যাতে ভোট রাজনীতির কারবারিদের দ্বারা বিপথগামী না হয়, এ বিষয়ে সচেতন থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। সাধারণ মানুষকেও আরও বেশি করে এদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে তাদের ঘরের সন্তানদের লেখাপড়া আরও বিপন্নতায় পড়বে। এ শুধু চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন শিক্ষা ও শিক্ষক বাঁচানোর আন্দোলন।

১৬ মে সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস সর্বত্র পালিত

বিকাশ ভবনে বিক্ষোভ অবস্থানে তৃণমূলের দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী এবং পুলিশ নৃশংস আক্রমণে রক্তাক্ত করল যোগ্য শিক্ষকদের। এই বর্বরোচিত আক্রমণকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এসইউসিআই(সি) রাজ্য কমিটির আহ্বানে ১৬ মে সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়।
ছবি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা

মৈপীঠে এআইডিএসও-র মতবিনিময় সভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এআইডিএসও মৈপীঠ ইউনিটের পক্ষ থেকে ৪ মে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়েও মত বিনিময় করেন।

খাদ্যকে অস্ত্র করে গাজার মানুষকে মারতে চাইছে ইজরায়েল

প্যালেস্টাইন থেকে সেখানকার আদি বাসিন্দা আরব জনগোষ্ঠীর চিহ্নটুকুও মুছে দিতে চায় উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েল। সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রকম মদতে পুষ্ট ইজরায়েল বিধ্বংসী বোমাবর্ষণে বস্তুত গোটা প্যালেস্টাইনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ, যার এক-তৃতীয়াংশই নাবালক। এবার সেখানকার গাজা ভূখণ্ডকে মুঠোয় পোরার মতলবে গাজার খাবার সরবরাহ কেন্দ্র, খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার গুদামঘর ও রান্নাঘরগুলিকে হামলার নিশানা করেছে ইজরায়েল। গাজার সরকারি প্রচারদপ্তর জানিয়েছে, সম্প্রতি মধ্য গাজার ডের আল-বালাহ্-তে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী খাবারের একটি গুদামঘরে বোমা ফেলেছে। এতে মৃত্যু হয়েছে গাজার পাঁচ ক্ষুধার্ত নাগরিকের, আহতের সংখ্যা বহু। খাবারের খোঁজে ওখানে জড়ো হয়েছিলেন এঁরা। গত কয়েক সপ্তাহে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন প্যালেস্টাইনের কয়েকশো মানুষ। বস্তুত অনাহারকে এবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েল।

জানা গেছে, এ পর্যন্ত গাজার ৬৮টি খাদ্য-কেন্দ্র ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়েছে। গাজার সীমান্তে সবকটি প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি গত মার্চ থেকে কোনওরকম ত্রাণসামগ্রী সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না ইজরায়েল। এমনকি খাদ্য ও ওষুধপত্রেও ছাড় নেই। ফলে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার পর্যন্ত পাচ্ছেন না বিধ্বস্ত প্যালেস্টাইনের বিপর্যস্ত মানুষ। অসুস্থ হলে মিলছে না ওষুধপত্র। খাবার সরবরাহকারী গাড়ির সামনে একটু খাবারের জন্য মরিয়া হয়ে ঠেলাঠেলি করতে থাকা অনাহারী মানুষের ছবি সংবাদপত্রে দেখে শিউরে উঠতে হচ্ছে। সে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বড়দের ভিড় ঠেলে কোনও ক্রমে সামনে এগিয়ে এসে একবাটি খাবারের জন্য দুধের শিশুদেরও বাড়িয়ে ধরতে হচ্ছে তাদের শীর্ণ হাত। এবার এই খাবার সরবরাহ কেন্দ্রগুলিতেও বোমা ফেলছে ইজরায়েল। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ হেন নিষ্ঠুরতার নজির বোধহয় খুব কমই আছে।

সমস্ত রকম আন্তর্জাতিক আইন দু-পায়ে মাড়িয়ে খুব সুপরিকল্পিত ভাবেই গাজায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি করেছে নরঘাতী সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্র ও তার সরকার। তার মতলব হল গোটা প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের দখল নেওয়া। তাই বোমার আঘাতে প্যালেস্টাইনকে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। নারী, শিশু সহ সেখানকার বাসিন্দারা প্রাণের তাগিদে ছুটে চলেছেন এক আশ্রয় শিবির থেকে আরেক আশ্রয় শিবিরে। যদিও গোটা বিশ্বের ধিক্কারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আশ্রয় শিবিরগুলিকেও বোমা মেরে ধ্বংস করতে পিছপা হতে দেখা যাচ্ছে না নরঘাতী ইজরায়েলকে। এর সঙ্গে এবার প্যালেস্টাইনের বাসভূমি থেকে উৎখাত হওয়া ক্লান্ত, আতঙ্কিত, চরম বিপর্যস্ত মানুষগুলিকে অনাহারে তিলে তিলে মারার ছক কষেছে ইজরায়েল।

এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে পৃথিবীর দেশে দেশে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মানুষ। বিক্ষোভ হচ্ছে খোদ ইজরায়েলেও। প্যালেস্টাইনের সরকারের পক্ষ থেকেও রাষ্ট্রসংঘ, প্রতিরক্ষা কাউন্সিল সহ বিশ্বের মানবিক সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলিকে সুরক্ষিত রাখা, সীমান্তের প্রবেশপথগুলি খুলে দেওয়া ও গাজায় ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগী হতে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলির কাছে তারা আবেদন জানিয়েছে যাতে ইজরায়েলের এই বর্বরতার খবর গোটা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বাস্তবে অবরুদ্ধ গাজার নিরুপায় মানুষের মুখ থেকে খাবারের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তিল তিল করে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার যে ভয়ঙ্কর রাস্তা নিয়েছে ইহুদিবাদী ইজরায়েল, তার বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে মানুষ আজও যদি সরব না হয়, তার অর্থ দাঁড়ায় পরোক্ষ ভাবে ইজরায়েলের নরমেধ যজ্ঞের ষড়যন্ত্রে সামিল হওয়া।

সমাজতান্ত্রিক শিবির ও বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অনুপস্থিতিই যে আজ ইজরায়েলকে এ হেন গণহত্যার সাহস জোগাচ্ছে এ কথা বুঝে সর্বশক্তি দিয়ে ইজরায়েলের হত্যালীলার বিরুদ্ধে আজ সমস্ত স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষকে দাঁড়াতেই হবে।

এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত সমস্ত বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট • ব্লক-৪ • স্টল নং - ১৫

আবাস তালিকাতে ঝুপড়িবাসীদের নাম বাদ
বিক্ষোভ দাঁতনে

আবাস সার্ভেতেও চরম দুর্নীতি। আবাস তালিকা থেকে গরিব, ঝুপড়িবাসী আদিবাসীদের নাম বাদ দেওয়া হলেও বহু ধনী ব্যক্তির নাম শোভা পাচ্ছে তালিকায়। এর প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে গরিব আদিবাসীদের ঘর, শৌচালয় ও কলোনির রাস্তার দাবিতে জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৫ মে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের খাকুড়দায় বিক্ষোভ মিছিল ও বিডিও-র মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

রবীন্দ্র মুর্মু, সীতা মাণ্ডি, শম্ভু সানকি, রায়চাঁদ সিং, দীপক টুডু, শুকলাল হেমব্রম সহ হতদরিদ্র অসংখ্য মানুষের নিজের পাকা বাড়ি না থাকলেও আবাস নির্মাণ তালিকায় এদের নাম নেই। জনঅধিকার সুরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে ব্লক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কার্যকরী পদক্ষেপ না হওয়ায় ২ হাজার ২২ জন ঝুপড়িবাসীর তালিকা করে ছবি সহ জমা দেওয়া হয়। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক বঙ্কিম মুর্মু বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও দেশে জনজাতি সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষের নিজস্ব দলিলভুক্ত জমি নেই। বহু মানুষ যাঁরা সরকারি জায়গায় বসবাস করছেন তার থেকেও উচ্ছেদ করা হচ্ছে। খাস জমি পাট্টা দেওয়ার প্রশ্নে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। বংশপরম্পরায় বসবাসকারী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জল জমি জঙ্গলের অধিকার আইনগত ভাবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান তিনি।

ছাত্ররা ধর্মঘট করল মার খেয়েই

একের পাতার পর

বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপর ১৫ মে রাজ্য সরকারের দলদাস পুলিশ বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে আজ সারা রাজ্য জুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এআইডিএসও-র ডাকে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। সকাল থেকেই কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এআইডিএসও-র কর্মীরা ধর্মঘটের সমর্থনে গেট পিকেটিং করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানান এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য। বহু জায়গায় তৃণমূলী গুন্ডাবাহিনীর হুমকি উপেক্ষা করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই ধর্মঘটে সাড়া দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা কলেজ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের সামনে গেট পিকেটিং চলাকালীন টিএমসিপি-র বহিরাগত গুণ্ডাবাহিনী সংগঠনের কর্মীদের ওপর বিনা প্ররোচনায় হামলা করে এবং ধর্মঘট ভাঙতে চায়। এই হামলাকে উপেক্ষা করে সংগঠনের কর্মীরা এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। হামলায় সারা রাজ্যে ১৭ জন কর্মী আহত হয়েছেন, কোচবিহারে ৭ জন কর্মী গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার যোগ্য শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে ভাঙার জন্য যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, একইভাবে আজও রাজ্যে যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনের সমর্থনে এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর দাবিতে ডাকা ধর্মঘটকেও ভাঙার জন্য সচেষ্ট থেকেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। পাশাপাশি এ রাজ্যের ছাত্র সমাজকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য। আজকের স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট প্রমাণ করলো পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজ রক্তাক্ত, আক্রান্ত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পাশে আছে।

সকল যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সসম্মানে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে এবং সর্বোপরি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচাবার দাবিতে এআইডিএসও-র আন্দোলন জারি থাকবে। এই আন্দোলনকে সর্বাত্মক সমর্থন করার জন্য সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ ও সকল শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে সংগঠন।

ছবি ঃ শিলিগুড়ি (উপরে) ও বেলদা

পাঠকের মতামত

এত ছুটি কেন

৩০ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের গরমের ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে আবহাওয়া দপ্তরের পরামর্শ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। এপ্রিল মাসের বেশিরভাগ দিনেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে ছিল। মে মাসেও এখনও রাজ্যের সর্বত্র মারাত্মক গরম পড়েনি। প্রায়ই ঝড়, বৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে গরম পড়েনি বললেই চলে।

গরমকালে গরম পড়বে এটাই স্বাভাবিক। গরমের জন্য পড়াশোনা বন্ধ রাখা কি তার সমাধান হতে পারে? তা ছাড়া এ ভাবে চললে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়বার কারণে তো লেখাপড়া বন্ধই করে দিতে হয়! ফলে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও পাঠদান কীভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেজন্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা তো করা উচিত ছিল। এ বছর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সকালে ক্লাসের জন্য স্কুলের পক্ষ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছিলেন। কয়েকটি জেলা আবেদন করলেও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় মর্নিং-স্কুলের নোটিশ দিয়েও তা বন্ধ করে দেওয়া হল।

সরকার যদি শিক্ষার প্রতি আন্তরিক হত তবে গরমে প্রতিটি ছাত্রের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করা এবং নিয়ম করে তা পান করানোর জন্য 'ওয়াটার বেল' চালু করার পাশাপাশি ওআরএস, সরস ফল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু এসব কোনও পথেই না গিয়ে তারা কেবল ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। এ ছাড়া নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উৎসব, মেলা, দুয়ারে সরকার ইত্যাদি কারণে দীর্ঘ ছুটি থাকে স্কুলে। এ কারণে অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ছুটছেন। আর এদিকে ছাত্র কমে যাওয়ায় সরকারি ৮২০৭টি বিদ্যালয় উঠে যেতে বসেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের অভাবে সেকশন বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর সাথে ২০১৬ সালের এসএসসি-র দুর্নীতির ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল শিক্ষা ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, টেট ২০১২ এবং টেট ২০১৪-এর দুর্নীতির কারণে যথাক্রমে ১৮ এবং ৪২ হাজার মোট ৬০ হাজার শিক্ষকের চাকরি যদি বাতিল হয় তাহলে সমগ্র স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে যাবে।

কারণে-অকারণে স্কুল ছুটি দেওয়ার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল অনলাইন শিক্ষা চালু করা। কারণ স্কুল বন্ধ থাকলে ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয় অনলাইনে পাঠ গ্রহণ করতে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' এবং 'রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩'-এর অন্যতম উদ্দেশ্য ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ অনলাইনে পাঠদান করার ব্যবস্থা করা।

এতে সরকারকে স্কুল-কলেজের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষক নিয়োগে ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে না। এক-দুজন শিক্ষক দিয়ে একসাথে অনেক ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান করানো যাবে। বাইজুস, টিউটোপিয়া, গুগল প্রভৃতি অনলাইন শিক্ষা ব্যবসায়ীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করার পথ আরও প্রশস্ত হবে। গরিব শিক্ষার্থী শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে ছিটকে যাবে। সরকারের এই অপরিকল্পিত ভাবে ছুটি দেওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ধ্বংসকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

দীপঙ্কর মাইতি
পশ্চিম মেদিনীপুর

অর্থ কে জোগায়, তা দিয়েও দল চেনা যায়

২ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা মানে ঠিক কতখানি টাকা, আমাদের গরিব দেশের অধিকাংশ মানুষই ভাবতে পারেন না। গুগলের তথ্য দেখাচ্ছে, ভারতবর্ষে মাথা পিছু গড় বার্ষিক আয় এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকার কিছু কম, অর্থাৎ মাসে পনের হাজার টাকারও কম। ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই টাকায় সংসার চালাতে যে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে, বলাই বাহুল্য। এবং একটা বিরাট অংশের দরিদ্র মানুষের আয়ের প্রকৃত ছবিটা এর চেয়েও অনেক বেশি খারাপ। অথচ যে সব বড় বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচনের আগে মানুষের সেবা করার কথা বলে ক্ষমতায় আসে, দেশের তেমন ছ'টি জাতীয় দলের এক বছরে প্রাপ্ত মোট অনুদান ২ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে এই দলগুলোর নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া তথ্য থেকে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এডিআর (অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম)। এই অনুদানের সিংহভাগ— ৮৮ শতাংশ পেয়েছে দেশের শাসক দল বিজেপি, তাদের প্রাপ্ত অনুদান প্রায় ২২৪৪ কোটি টাকা। এর পরেই আছে কংগ্রেস। বাকি পাঁচটি দলের তহবিলে মোট যত টাকা জমা হয়েছে, তার ৬ গুণেরও বেশি গেছে বিজেপির একার ভাণ্ডারে। এই অনুদান দিয়েছে কারা? দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থক বা দেশের সাধারণ মানুষের এই পরিমাণ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই এ কথা সকলেই বোঝেন। তা হলে এই বিপুল অঙ্কের টাকা কোথা থেকে এল? এর নব্বই শতাংশই হচ্ছে কর্পোরেট অনুদান, অর্থাৎ বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি, একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা সারা বছর ধরে টাকা ঢেলেছেন এসব দলের পিছনে। মোট কর্পোরেট অনুদানের ৯১ শতাংশ, প্রায় ২০৬৫ কোটি টাকা গেছে বিজেপির ঘরে। বিগত বছরের চেয়ে এসব অনুদান বিজেপি এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রে প্রায় ২০০-২৫০ শতাংশ বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি অনুদান এসেছে প্রুডেন্ট ইলেকটোরাল ট্রাস্ট নামে একটি সংস্থার কাছ থেকে, যার মধ্যে আছেন শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, আছে মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং, ভারতী এয়ারটেল, ডিএলএফ-এর মতো সংস্থাগুলো। দেশের মানুষের রক্ত জল করা শ্রম লুট করে যারা মুনাফার পাহাড় বানাচ্ছেন, দেশের দারিদ্র-বেকারি-অপুষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে যাদের সম্পত্তির পরিমাণ বাড়ছে, সেই ধনকুবেররা এইসব দলকে টাকা দিচ্ছেন কেন?

২০১৬ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ে। তামিলনাড়ুর এক কৃষক সাত লাখ টাকা ধার করে একটি ট্রাক্টর কিনেছিলেন। পাঁচ লাখ শোধ দেওয়ার পর বাকি দু লাখ তিনি দিতে পারছিলেন না। এর শাস্তি হিসেবে ঋণদাতা সংস্থাটি তার ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করে নেয়। ছাব্বিশ বছরের সেই যুবক পরের দিন আত্মহত্যা করেন। বিজয় মাল্যর মতো কোটিপতি যদি ব্যাঙ্কের লক্ষ কোটি টাকা ঋণ ফাঁকি দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াতে পারেন, তা হলে দেশের এক গরিব কৃষককে দু'লক্ষ টাকার জন্য এমন মাশুল দিতে হবে কেন, এই প্রশ্ন সেদিন ধাক্কা দিয়েছিল বহু সংবেদনশীল মানুষের মনে। এই 'কেন'-র কারণ খুব পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল গত বছর নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোবার পর। বন্ড বস্তুটি বিজেপি সরকার চালু করেছিল স্বচ্ছতা রক্ষার নাম করে, অথচ এই রায়ের পর প্রকাশিত নানা তথ্য থেকে দেখা গেল বন্ডের সাথে অস্বচ্ছতার শক্ত বন্ডিং। নির্বাচনী বন্ড ছিল কার্যত বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানি এবং কর্পোরেট মালিকদের ক্ষমতাসীন দলগুলোকে দেওয়া ঘুষ, যার বিনিময়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এইসব সংস্থা নানা চুরি, দুর্নীতি, বেআইনি কাজকর্ম দিব্যি চালিয়ে গেছে এবং তাদের কোনও শাস্তিও হয়নি। বন্ডদাতাদের নাম আড়াল করে মোদি সরকার এই সম্পূর্ণ বেআইনি লেনদেনকেই আইনসিদ্ধ করতে চেয়েছিল এবং ছ'বছর ধরে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস সহ বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দলের ভাণ্ডারে বন্ডের বিপুল অর্থ জমাও হয়েছিল। বন্ড বাবদ বিজেপির প্রাপ্ত অর্থ ছিল প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। জমা করেছিলেন কারা? বিভিন্ন ধনকুবেররা। এঁদের কারও আবগারি দুর্নীতি, কারও জাল ওষুধের কারবার, কারও জমি কেলেঙ্কারি দিব্যি মাফ হয়ে গেছিল এই বন্ডের কল্যাণে। কাজেই এ দেশে বিজয় মাল্যরা কেন সাধারণ মানুষের লক্ষ কোটি টাকা চুরি করে পালাতে পারেন, আর গরিব চাষির দু'লক্ষ টাকার বেলায় আইনের ফাঁস গলায় চেপে বসে, সেই অঙ্ক খুব সোজা। গত বছর কোর্টের রায়ের পর বেনামি বন্ডের বেচাকেনা আপাতত বন্ধ হলেও এডিআর-এর এই রিপোর্ট পরিষ্কার দেখিয়ে দিল, ভোটসর্বস্ব দলগুলোর সাথে পুঁজিপতিদের এই লেনদেনের সম্পর্ক অটুট আছে শুধু নয়, দিন দিন মজবুত হচ্ছে। এই দলগুলো ভোটের আগে যতই জনগণের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুক, এদের আসল দায়বদ্ধতা পুঁজিমালিকদের প্রতি। পুঁজিপতিদের টাকায় ভর করে তাদের আশীর্বাদ নিয়েই তারা ক্ষমতায় বসে এবং স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় এসে একেবারে গলবস্ত্র হয়ে তাদের স্বার্থই রক্ষা করে। এই টাকাগুলো যায় কোথায়? যায় এইসব দলের নেতা-মন্ত্রীদের বিলাস ব্যসনে, নির্বাচনের সময় চোখধাঁধানো প্রচারের জৌলুসে। এই টাকার জোরেই দলগুলো ভোট কেনার জন্য টাকার থলি হাতে ধরিয়ে যুবকদের নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত করে, প্রলোভন দেখায়। গরিব মানুষকে সাময়িক কিছু পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বারবার তাদের ভোটের জন্য ব্যবহার করে। নির্বাচনকে যতই 'গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব' নাম দেওয়া হোক, আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচন হল এই টাকা এবং পেশিশক্তির খেলা।

কোনও রাজনৈতিক দল যদি সত্যিই মানুষের স্বার্থ নিয়ে লড়ে, সততার আদর্শের রাজনীতি করে, তারা কখনও পুঁজিপতিদের কাছে সাহায্য চাইতে পারে না, আর পুঁজিমালিকরাও কখনোই এমন দলের শক্তি বৃদ্ধি হতে দেবে না। তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী সেই দল তহবিল সংগ্রহ করবে সাধারণ মানুষের থেকেই, যেমনটা একসময় স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকরা করতেন। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) -কে মানুষ এইভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে দেখেন। এই দলের কর্মীরা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এই এডিআর রিপোর্ট আবারও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, অর্থ এবং তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি একটি দলের যথার্থ শ্রেণিচরিত্রকে চেনার অন্যতম উপায়।

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার যে ভাবে জোর করে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার লাগাচ্ছে তার প্রতিবাদে ১৫ মে আগরতলায় বিক্ষোভ দেখায় ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিক্যাল কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন।

বিক্ষোভ সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফর্মার এবং বিদ্যুৎ লাইন সারাইয়ের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে তো বটেই শহরাঞ্চলেও গ্রাহকরা প্রতি মাসে বিল পায় না। বিদ্যুৎমন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে মাত্র ৪১ শতাংশ মাশুল কেন আদায় হচ্ছে। তার কারণ চিহ্নিত করে পুরো মাশুল আদায়ের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে তার দায়ভার গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির পরিকল্পনা চলছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

বিদ্যুৎ দপ্তরের ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় চৌধুরী, মিলন চক্রবর্তী, হরকিশোর ভৌমিক, চমক দেববর্মা এবং মলিন দেববর্মা।

কিসের মডেল গুজরাট?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর অনুগামীরা গুজরাটকে প্রায়শই ভারতের মধ্যে একটি 'মডেল' রাজ্য হিসাবে তুলে ধরেন। কেমন মডেল এই রাজ্য? এটি এখন এমন একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছে যেখানে জনগণ আড়াআড়ি সাম্প্রদায়িক বিভাজনে বিভক্ত। এখানে মুসলিমবিদ্বেষী কথা অশ্লীলভাবে উচ্চারিত হয়। ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক গণহত্যার মধ্য দিয়ে আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদের ল্যাবরেটরি হিসাবে রাজ্যটিকে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাটে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য সবচেয়ে বেশি। গ্রামীণ পরিবারের নিচের দিকের ৫ শতাংশ পরিবারের খরচ করার ক্ষমতার তুলনায় শীর্ষ ৫ শতাংশের খরচ করার ক্ষমতা অন্তত ৮-১০ গুণ বেশি। সোশাল মিডিয়ায় প্রায়শই সেখানকার ভাঙাচোরা রাস্তা, জীর্ণ সরকারি বাস, আবর্জনায় ঢাকা সড়ক, নর্দমার জলে প্লাবিত রাস্তা, ভাঙা সেতু, অসম্পূর্ণ নির্মাণের পাশাপাশি সোয়াইন ফ্লু-তে অসুস্থ এবং মৃত মানুষের ছবি এবং ভিডিও ক্লিপগুলি 'বিকাশ' তথা উন্নয়নের ঢক্কানিনাদকে ব্যঙ্গ করে।

গুজরাটি সমাজে 'বিকাশ' হল পুরুষদের একটি সাধারণ নাম। সম্প্রতি নবরাত্রির উৎসবের সময় 'বিকাশ গন্ডো থায়ো ছে' (উন্নয়ন পাগল হয়ে গেছে) থিমের উপর নতুন গান প্রকাশিত হয়েছে। এমন 'বিকাশ' যে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিও বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে খারাপ অবস্থায় আছে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে রাজ্যের ৮০ শতাংশেরও বেশি ইঞ্জিনিয়ার বেকার। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২০ সালের জুলাই থেকে গুজরাটে প্রায় ৫,৯৭৪টি অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্য বাণিজ্যিক কর দফতরের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ৪.০৫ লক্ষ জিএসটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (জিএসটিআইএন) বাতিল করা হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ ও নগর উন্নয়ন, শ্রম কল্যাণ) রাজ্য জিডিপির শতাংশ হিসাবে ব্যয়ের নিরিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক প্রতিবেদনে গুজরাটকে ১৮টি বড় রাজ্যের তালিকায় একেবারে নিচের দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। গুজরাটের স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় রাজ্য জিডিপির ০.৭ শতাংশ এবং এটি ভারতের সর্বনিম্ন রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। বেশিরভাগ প্রান্তিক জেলা খরাপ্রবণ এবং কৃষি ও গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় জনগণ শহরগুলিতে সর্বনিম্ন গড় দৈনিক মজুরিতে হলেও বছরের অন্তত কয়েকটি মাসের জন্য কর্মসংস্থান চায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি এক দশকেরও বেশি সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকাকালীন সেই কর্মসংস্থানের সুযোগও হ্রাস পেয়েছে।

গত পাঁচ বছরে গুজরাটে নারী ও শিশুদের উপর সংগঠিত অপরাধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র এমনই প্রকট যে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের আহমেদাবাদ সফরের সময় শহরের পৌর কর্পোরেশন বিমানবন্দর থেকে 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠানের স্থান পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথের পাশে বস্তির একটি অংশ লুকানোর জন্য চার ফুট উঁচু প্রাচীর তৈরি করেছিল। এই সমস্ত তথ্য গুজরাটের 'উন্নয়নের মডেলে'-র লম্বা-চওড়া দাবিকে উপহাস করে।

গুজরাটের মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের ক্রমবর্ধমান অবনমন ঢাকতে, আরএসএস-বিজেপি-সংঘ পরিবার হিন্দু সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতাকে চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে গেছে। এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের উদ্দেশ্য ছিল শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা। এর তীব্রতা এতটাই যে রাজ্যের মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কার্যত জীবনের মূলধারার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 'গুজরাট ডিস্টার্বড এরিয়া অ্যাক্ট' বা 'গুজরাট উপদ্রুত এলাকা আইন'-

'মডেল' রাজ্য গুজরাটে...

- ৫,৯৭৪টি শিল্প বন্ধ
- ৮০ শতাংশের বেশি ইঞ্জিনিয়ার বেকার
- হিন্দু-মুসলমান বিভেদ বাড়াতে নানা আইনের ছড়াছড়ি

এর অপব্যবহার সাধারণ শ্রমজীবী জনগণের একতায় ফাটল ধরানোর জন্য সাম্প্রদায়িক বিষ কীভাবে উস্কে দেওয়া হচ্ছে তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

১৯৮৬ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন রোধ করতে এই আইন প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে (১৯৯১ সালে) এটিকে 'গুজরাট স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ এবং ভাড়াটেদের সুরক্ষার বিধান' হিসাবে পরিবর্তিত করা হয়। এটি সাধারণত 'গুজরাট বিশৃঙ্খল এলাকা আইন' নামে পরিচিত। আইন অনুযায়ী কোনও অশান্ত এলাকায় সম্পত্তির কেনাবেচা, বা হস্তান্তর করতে হলে জেলা কালেক্টরেটের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হিংসার মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে দুর্দশার কারণে যাতে কেউ সম্পত্তি বিক্রয় করে চলে না যায় সেটা দেখা। এর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ রোধ করা। কিন্তু, বিজেপি শাসনকালে, যে এলাকায় উভয় সম্প্রদায় একসঙ্গে বাস করে, সেখানে একজন হিন্দু বিক্রেতার কাছ থেকে একজন মুসলিম ক্রেতার কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর রোধ করতে এই আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে।

এই ধরনের অপব্যবহারের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এ বছর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে, সুরাটের জেলা আধিকারিকরা সালাবতপুরা এলাকায় একটি হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে একটি মুসলিম পরিবারের কেনা বাড়ি সিল করে দেয়। 'গুজরাট ডিস্টার্বড এরিয়া অ্যাক্ট'-এর অপপ্রয়োগের এটি একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। অভিযোগ করা হয়েছে যে, মুসলিম ক্রেতা তাদের কেনা বাড়িতে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা না করায় সেটি 'গুজরাট ডিস্টার্বড এরিয়া অ্যাক্ট'-কে 'লঙ্ঘন' করেছে। প্রায় এক বছর পর, একটি সরকারি দল সেখানে পরিদর্শনের জন্য আসে এবং হিন্দু প্রতিবেশীদের আপত্তির কারণ দেখিয়ে উক্ত মুসলিম পরিবারের বাড়িটি সিল করে দেয়। ১৫ সদস্যের যৌথ পরিবারটি বাধ্য হয়ে এখন শহরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। (সূত্র ঃ দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) এর আগে, ২০১৮ সালে, ভদোদরা বা পূর্বতন বরোদার কেশরবাগ সোসাইটির বাসিন্দারা স্রেফ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে এক হিন্দু মালিকের থেকে একজন মুসলিম ক্রেতার কাছে একটি বাংলো স্থানান্তরের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। যদিও সেই ক্ষেত্রে কালেক্টর লেনদেনের অনুমতি দিয়েছিলেন। হাইকোর্টও ২০২৩ সালে ওই বিক্রয় বহাল রাখে। আরেকজন মুসলিম মহিলা ২০১৮ সাল থেকে 'সিএম আবাস যোজনা' প্রকল্পের আওতায় তাঁর জন্য বরাদ্দ করা একটি ফ্ল্যাট দখল করতে পারেননি, কারণ ওই 'সোসাইটি'-র ৪৬২ জন বাসিন্দার মধ্যে ৩৩ জন তাঁর উপস্থিতিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ মুসলিম হওয়ায় তিনি নাকি 'বিপদ ও উপদ্রব' ঘটাতে পারেন (সূত্রঃ ওই)। এই যে বিদ্বেষ, এটাই বিজেপি কথিত মডেল!

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি দেখায় যে গুজরাটে মুসলমানদের বৃহত্তর সমাজ থেকে পৃথক করার জন্য 'বিশৃঙ্খল এলাকা আইন' ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেসব অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলিমরা পাশাপাশি বাস করে, সেগুলিকে 'অশান্ত এলাকা' বলে চিহ্নিত করে ওই আইনটিকে পিছনের দরজা প্রয়োগ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই— হিন্দু এবং মুসলিম জনগণের বসবাসের স্থানকে আলাদা করে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, সুদূর অতীত থেকেই গুজরাট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়মূলক ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এখানে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে যথাযথ সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে একসাথে বসবাস করে আসছে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে গিয়ে বসন্তরাও হেগেস্তে এবং রাজাবলী লাখানি শহিদ হন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দৃশ্যটি, স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া নেতাদের হীন স্বার্থ পূরণের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হয়েছে। নির্মম পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ভেঙে দিতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোট-ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য ধর্মীয় ভিত্তিতে মেরুকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন কংগ্রেস বা তার বিভিন্ন শাখা ক্ষমতা দখলের জন্য নিয়মিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চালিয়ে গিয়েছে। একবার এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হলে, আরএসএস-বিজেপি-সঙ্ঘ পরিবার, যাদের রাজনীতির একমাত্র ভরকেন্দ্র হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড দিলীপ চ্যাটার্জী ১৪ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। কমরেড দিলীপ চ্যাটার্জী ১৯৭৪ সালে আসানসোলের সেই সময়ের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সমর চ্যাটার্জীর সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে দলের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রয়াত কমরেড বাদশা খানের সাহচর্যে দলের কর্মীতে পরিণত হন।

অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁকে অল্প বয়স থেকেই চায়ের দোকান, হোটেল ইত্যাদি জায়গায় কাজ করে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরবর্তীকালে ইস্কোতে (ইস্পাত কারখানা) ঠিকা শ্রমিকের কাজ পান। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রয়াত নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী হিসাবে নিয়মিত কাজে নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়ার পদক্ষেপ নিলে অনেক শ্রমিকের সাথে কমরেড দিলীপ চ্যাটার্জীও ইস্কোতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি পান। কমরেড দিলীপ প্রথাগত লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, কিন্তু দলের পত্র-পত্রিকা পড়া ও বিভিন্ন কর্মসূচি মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্য এবং পোস্টার ও দেওয়াল লিখনের তাগিদ থেকে তিনি লিখতে ও পড়তে শেখেন।

তিনি মানুষের সাথে মেলামেশা করতেন গভীর আবেগের সঙ্গে। ফলে, অনেককেই প্রভাবিত করে বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচিতে নিয়ে আসতে এবং বেশ কয়েকজনকে দল ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি দলের প্রয়োজনে যেমন পরিচিতদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন, নিজেও সাধ্যাতীত দিতেন। বহু সময়ে পূজার বোনাস পুরোটাই দলের হাতে তুলে দিতেন। প্রথমে তাঁর মা এতে আপত্তি করলেও পরে কমরেড দিলীপ চ্যাটার্জীর প্রভাবে সেই মা এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং ধীরে ধীরে তিনিও দলের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হন। ইস্কোতে ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড দিলীপ চ্যাটার্জীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

জীবনের শেষ দিকে নানা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দলের কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করতেন। কমরেডরা গেলে অনুরোধ করতেন গণদাবী পড়ে শোনাতে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চাকরিজীবনের সাথী, আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী ও দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন।

দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডুর পক্ষ থেকে লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড দেবদাস চ্যাটার্জী ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন কর্মকার, জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য নেতা-কর্মীরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। লাল সেলাম ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁর শেষযাত্রা শুরু হয়।

কমরেড দিলীপ চ্যাটার্জী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 41 Bengali Weekly May 23, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

শিক্ষকদের উপর পুলিশি আক্রমণ
প্রতিবাদ সেভ এডুকেশন কমিটির

যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত বৈধ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ এবং শাসক দলের দুষ্কৃতীদের পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৮ মে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আলোক প্রধান ও দীপঙ্কর তেওয়ারি, শিক্ষক প্রদীপ দাস, সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর (দক্ষিণ)-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ডঃ বাসুদেব ধাড়া, শিক্ষক অশোক পালোই, অনিন্দ্য সুন্দর পাল, প্রতাপ কুমার পণ্ডা প্রমুখ।

বক্তারা দাবি করেন, সকল যোগ্য শিক্ষককে সসম্মানে চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষকহীন করে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করতে হবে এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সেনাস্কুল যাচ্ছে আরএসএস-এর হাতে

রিপোর্টার্স কালেক্টিভ নামক এক সংস্থার প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ২০২১-এর ১২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয়, এ যাবৎ প্রতিরক্ষা দপ্তর পরিচালিত সৈনিক স্কুলগুলিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে অন্যান্য স্কুলের তুলনায় সেগুলো একদম পৃথক হয় এবং এক নতুন নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

কী সেই নীতি? তথ্য আইনের ভিত্তিতে জানা গেছে, ৬২ শতাংশ সৈনিক স্কুলকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবনে এরকম একটি স্কুল চালান সাধ্বী ঋতাম্ভরা। বিশ্বহিন্দু পরিষদের মহিলা শাখার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল। তিনি আরেকটি স্কুল চালান হিমাচল প্রদেশের সোলানে। এই স্কুলটি সম্প্রতি প্রাইভেট-পাবলিক কাঠামো অনুযায়ী সৈনিক স্কুলের অন্তর্ভুক্তির আবেদন করেছে।

এই নীতি অনুযায়ী সরকার এই সৈনিক স্কুলগুলিকে ছাত্রদের থেকে নেওয়া ফি-এর ৫০ শতাংশ অনুদান দেয়। অর্থাৎ হিসাব মতো এই স্কুলগুলি প্রত্যেক বছরে প্রায় ১.২ কোটি টাকার সরকারি সাহায্য পায়। এ ছাড়াও বছরে ১০ লক্ষ টাকার অনুদান আসে প্রশিক্ষণ বাবদ। এ সত্ত্বেও, সেই সব স্কুলে বছরে ১৩,৪০০ টাকা থেকে শুরু করে ২,৪৭,৯০০ টাকা পর্যন্ত ফি নেওয়া হয়। ২০২১ সালে সৈনিক স্কুলগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে গৃহীত হয়। সেই মতো ১০০টি সৈনিক স্কুল গড়ে তোলার অছিলায় সৈনিক স্কুলগুলিকে আর এস এস-সংঘ পরিবারের আওতায় নিয়ে আসার নীল নকশাটি রচিত হয়।

শিক্ষার গৈরিকীকরণ এবং শিক্ষাকে প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের আবহে পরিবেশিত করে ছাত্রদের ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার ভিত্তিক আচার-আচরণ, যুক্তিহীনতা এবং অন্ধ বিশ্বাসের নিগড়ে বাঁধাই এর উদ্দেশ্য।

পানীয় জলের দাবি আদায়

একের পাতার পর

অসহায় পরিবারগুলি ১৪ মে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের নেতৃত্বে হাওড়া পুরপ্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়। ওই দিন বুকে পোস্টার ঝুলিয়ে পুরসভার ফটকে বিক্ষোভ দেখায় ভূমিধসে গৃহহারা পরিবারের সদস্যরা। গৃহহারারা অভিযোগ করেন, প্রশাসন তিন দিনের মধ্যে সব করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও এখনও কিছুই করেনি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ৯৬টি পরিবার চরম সমস্যায় দিন কাটাচ্ছে। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পুরসভার চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

আন্দোলনের চাপে এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা হলেও বেশিরভাগ নাগরিক পরিষেবার ব্যবস্থা এখনও হয়নি। প্রতিরোধ মঞ্চের জেলা নেতৃত্ব উত্তম চ্যাটার্জী, কার্তিক শীল, মিতা হোড় এবং পুতুল চৌধুরীরা বলেন, সমস্ত দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন আন্দামানে

২৫ এপ্রিল পোর্টব্লেয়ারের ভাতু বস্তিতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এসইউসিআই(সি) প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে পার্টির ৭৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক কমরেড বলরাম মান্না। সভায় পোর্টব্লেয়ার ছাড়াও লিটল আন্দামান, ডিগ্লিপুর আইল্যান্ডের কর্মী-সমর্থকরাও অংশ নেন।

জনজীবনের দাবি নিয়ে কর্ণাটকে
এস ইউ সি আই (সি)-র বিশাল মিছিল

মূল্যবৃদ্ধি রোধ, হাসপাতালে চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনায় বছরে ২০০ দিনের কাজ ইত্যাদি দাবিতে এবং ৬০০০ সরকারি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে ব্যাঙ্গালোরে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল। ১৫ মে

কিসের মডেল গুজরাট

সাতের পাতার পর

মৌলবাদ, তারা সেই দাঙ্গার সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে কোনও সময় ছাড়েনি। এমনকি কংগ্রেসও আরএসএস-এর পৃষ্ঠপোষকতা পেতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার দল হওয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যেমন ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত ইত্যাদি মানসিকতার ঊর্ধ্বে এক জাতি এক প্রাণের ধারণা আনতে পারেনি, তেমনি স্বাধীন ভারতেও বুর্জোয়া শ্রেণিশাসন পাকাপোক্ত করতে গিয়ে এ সব দূর করার পরিবর্তে জিইয়ে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। ফলে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিল না। সুতরাং, পুরনো এবং প্রাচীরবেষ্টিত আহমেদাবাদ শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মূলত যে 'বিশৃঙ্খল এলাকা আইন'টি রচনা করা হয়েছিল, কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয়ের শাসনকালে তার ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিক্রির জন্যই নয়, মেরামতের জন্যও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে রিয়েল এস্টেটের কারবারিদের জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের বাড়ি ও প্লট খুব সস্তায় দখল করার জন্যও এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের প্রোমোটাররা এর থেকে লাভবান হয়েছে। এখন বিজেপি শিবির এই আইনের এক্তিয়ার প্রাচীরবেষ্টিত শহরের বাইরে প্রসারিত করতে চাইছে। প্রথমত সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাড়ানোর জন্য এবং দ্বিতীয়ত ভাড়াটেদের হাতে থাকা বাড়িগুলি রিয়েলটি কারবারিদের কাছে খুব সস্তায় বিক্রি করতে বাধ্য করার জন্য।

'গুজরাট ডিস্টার্বড এরিয়া অ্যাক্ট' কার্যত রাজ্যের বিজেপি সরকারের হাতে কিছু বিশেষ অঞ্চলে মুসলিম জনগণকে সীমাবদ্ধ করার একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ঠিক যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে জার্মানি ও ইতালির নাৎসি ও ফ্যাসিস্টরা সংখ্যালঘু ইহুদিদের ঘেটোতে আবদ্ধ রেখেছিল। চিন্তায় চেতনায় বিজেপি এদেরই উত্তরসূরী। এটাই বিজেপির মডেল। এর বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হচ্ছে।

দাবি উঠছে, গুজরাট অশান্ত অঞ্চল আইন বাতিল করা হোক এবং জাতি, বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি বা কেনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হোক। পাশাপাশি, ধর্মীয় আনুগত্য, বর্ণ, ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে শুভ চিন্তাধারার লোকদের আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসক পুঁজিবাদী শ্রেণি এবং তাদের তল্পিবাহক বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দলের যে কোনও ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক বর্ণবাদী বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে উচ্চতর সংস্কৃতি ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com